দ্বিতীয় সংখ্যা । ফেব্রুয়ারি - ২০১৫

সিলেট অন্বেষা

ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক প্রকাশনা

মকবুল হোসেন চৌধুরী

বিচারপতি সৈয়দ এ বি মাহমুদ হোসেন

প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল কুদ্দুস

জগলুল আহমেদ চৌধুরী

এ সংখ্যায় লিখেছেন : দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ড. মোহাম্মদ সাদিক, হাসান শাহরিয়ার, দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, রাগিব হোসেন চৌধুরী, চৌধুরী গোলাম আকবর সাহিত্যভূষণ, প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান, নন্দলাল শর্মা, জালাল আহমেদ, সৈয়দ জয়নাল আবেদীন, আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

মেয়াদী)
%
৭.৫০ টাকা।
করমুক্ত।
কা এবং ১০,০০,০০০ টাকা।
ছর মেয়াদী)
ক্রয় করতে পারবেন।
ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত
করতে পারবেন।
ত্যায়ন ছাড়াই প্রবাসী
শী বংশোদ্ভূত বিদেশী
র্টের কপি প্রদান করে
াখা, বিদেশে অবস্থিত
এক্সচেঞ্জ কোম্পানীর
র সুযোগ আছে এবং
মান।
ংলাদেশী এবং তার
করমুক্ত।
২,০০,০০০ টাকা;
অধিদপ্তর
অর্থ মন্ত্রণালয়
সাথে যোগাযোগ করুন
nationalsavings.gov.bd-এ লগইন করুন

দ্বিতীয় সংখ্যা । ফেব্রুয়ারি - ২০১৫ ০

সিলেট অন্বেষা

ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক প্রকাশনা

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
এস এম জাহাঙ্গীর আলম

প্রকাশক
বহ্নি কুসুম

সম্পাদক
সাইফুল ফারুকী

নির্বাহী সম্পাদক
জাহিদ আহমেদ চৌধুরী (বিপুল)

প্রচ্ছদ
পাওয়ার প্রিন্ট লিমিটেড

সম্পাদকীয় কার্যালয়

সুরমা প্রকাশন
১১ বাংলাবাজার ৫ম তলা, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০১৯১১৪৭৬৫৩০, ০১৮৩৯৮৪৯২৩২
E-mail : surmaprokashon@yahoo.com

সম্পাদকীয়

সুরমা, কুশিয়ারা, মনু ও খোয়াই নদীবিধৌত সিলেট বিভাগে রয়েছে অফুরন্ত সম্পদের প্রাচুর্য। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে পরিশুদ্ধ হওয়ায় এ বিভাগ অন্যান্য জেলা থেকে স্বতন্ত্র। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ সিলেটবাসীদের নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। যার ফলস্বরূপ এখানে জন্ম হয়েছে কীর্তিমান মুনিঋষি, পীর-দরবেশ, পরিব্রাজকসহ উল্লেখযোগ্য কবি-লেখকের। যাঁদের সুকীর্তি বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের মুখ সমুজ্জ্বল করছে। এ জেলায় বাঙালি ছাড়াও খাসিয়া, মনিপুরী, নাগা, কুকি এবং পাত্র উপজাতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এরা পাহাড়ি অধিবাসী হলেও সমতলভূমির মানুষের সাথে বিনিময় ব্যবসায়ে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। হযরত শাহজালালের (রঃ) পুণ্য সংস্পর্শ, শ্রীচৈতন্যের ছায়াতলে মহিমান্বিত সিলেটে রূপমুগ্ধ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলমে তাই তো ভেসে ওঠে-

মমতাবিহীন কালস্রোতে/বাংলার প্রান্তসীমা হতে
নির্বাসিতা তুমি/সুন্দরী শ্রীভূমি।

সিলেটের এই সমৃদ্ধিকে বিদ্বৎসমাজে প্রচার করতে প্রকাশিত হচ্ছে *সিলেট অন্বেষা* পত্রিকা। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের প্রস্তুতি থাকার পরও সেটা সম্ভব হয়নি আর্থিক সহযোগিতার সঙ্কটে। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর দীর্ঘ বিরতি দিয়ে দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ করা হলো। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি *সিলেট অন্বেষা* পত্রিকার সফলতার সাথে, আনন্দের সাথে তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে ঢের। সবকিছু ছাপিয়ে সামনে এগিয়ে চলেছে সিলেট অন্বেষার দ্বিতীয় সংখ্যা। এই প্রকাশের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই লেখকদের, যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদেরও।

সাইফুল ফারুকী

ation Company Limited (NWPGCL)
ladesh Power Development Board)
4), 1 Abdul Gani Road, Dhaka-1000
9513530, E-mail: info@nwpgcl.org.bd
ration Utility in Bangladesh

l of electricity and mitigating the low-voltage
of the country, North-West Power Generation
ned, incorporated and registered on 28 August
nent Power Sector Reforms Policy and the
Company has primarily started its functioning
Project and Khulna 150 MW Peaking Power
Combined Cycle Power Plant Development
Combined Cycle Power Plant (1st Unit) and
eneration of electricity.
5 MW Combined Cycle Power Plant Project
W by using the flue gas of Khulna 150 MW
Company inked the deal of EPC contract with
2014 in order to implement Bheramara 360
nent Project. The Company inked the deal of
IC and FEDI, China on 20.03.2014 for
ed Cycle Power Plant (2nd Unit Dual Fuel)

VA) with CMC, China on 09.06.2014
ence of the Hon'ble Prime Minister
he Hon'ble Prime Minister of the
MW Thermal Power Plant Project
chnology (UST). The Bangladesh-
istered with the Registrar of Joint
as a Joint Venture Company under
Meeting of BCPCL was held on
1.2015 at Fuzhou, China. Besides this,
W LNG Based Combined Cycle Power
er Project and another Payra 1320 MW
eco-friendly Ultra Supercritical Technology

nd capable enough to incept cost-effective
any type of primary fuel. It intends to be the
ector to meet the demand of the society.

ony on the Joint Venture Agreement (JVA)
MW Thermal Power Plant Project under
VPGCL in Beijing, China

সূচি

বৃহত্তর সিলেটের পরিচয় : ইতিহাস ও ঐতিহ্য ৭
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
সৈয়দ শাহনূর ১৯
ড. মোহাম্মদ সাদিক
আসামে সিলেট : অতীতের মূল্যায়ন ২৬
হাসান শাহরিয়ার
মুসলিম সাংবাদিকতার প্রবাদপুরুষ ৩৯
রাগিব হোসেন চৌধুরী
সিলেটের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ইতিহাস ৪৭
দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী
বহুমুখী প্রতিভার প্রতিচ্ছবি বিচারপতি মাহমুদ হোসেন ৫৯
ইমাম উদ্দিন আহমদ চৌধুরী
সিলেটী নাগরী'র উৎপত্তি ৬৯
চৌধুরী গোলাম আকবর সাহিত্যভূষণ
ড. মোঃ আব্দুল কুদ্দুস : একজন নিরহংকার পণ্ডিতের প্রতিকৃতি ৮৩
প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান
সিলেটের লোকসাহিত্য : গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় ৮৮
নন্দলাল শর্মা
জগলুল আহমদ চৌধুরী : একজন সাদা মনের মানুষ ৯৮
জালাল আহমেদ
সিলেটের খণ্ড খণ্ড স্বাধীন রাজ্য ১০২
সৈয়দ জয়নাল আবেদীন
প্রিন্সিপাল আবদুর রব চৌধুরী ও তাঁর আলোকিত পরিবার ১১৮
আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

প্রিন্সিপাল আবদুর রব চৌধুরী ও তাঁর আলোকিত পরিবার

আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার দরিয়াপুর একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। জেলা শহর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গ্রামটির অবস্থান। এখানে নবাবী আমল থেকেই শিক্ষিত ও ভদ্রলোকের বসবাস। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে গ্রামটি অগ্রসর এলাকা হিসেবে গোটা অঞ্চলে পরিচিত ছিল। এ গ্রামের চৌধুরী পরিবার বৃটিশ আমলের শুরু থেকেই একটি শিক্ষিত ও প্রতাপশালী পরিবার হিসেবে খ্যাতি লাভ করে । এ পরিবারে অনেক লোক আরবি, ফার্সি ও ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করে নানাভাবে দেশ ও সমাজের খেদমত করেছেন। পরিবারের ইতিহাস সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তাদের পূর্ব পুরুষ পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। পারস্য থেকে ভাগ্যান্বেষণে দিল্লী হয়ে মুর্শিদাবাদের বিজনী এলাকায় বসবাস শুরু করেন এবং নবাবের দরবারে চাকুরি লাভ করেন। পলাশীর যুদ্ধের পর নবাবী আমলের প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত লোকদের নানাভাবে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটতে শুরু করে। তাদের অনেকেই মুর্শিদাবাদ এলাকা ত্যাগ করে পূর্ব বাঙলা ও আসামের দিকে পাড়ি জমান। এভাবেই এ পরিবারটিও লোক-লসকরসহ বর্তমান হবিগঞ্জের বরচর এলাকায় চলে আসে এবং কয়েক বছর পরে সেখান থেকে দরিয়াপুর গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করে। পরিবারটি ধীরে ধীরে বিপুল ভূ-সম্পত্তির মালিকানা লাভ করে। পরবর্তীকালে মোহাম্মদ জামিল নামে এ পরিবারের একজন আরবি ও ফার্সি ভাষায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন । তিনি বৃটিশ শাসনের প্রথম দিকে লসকরপুর দেওয়ানী আদালতে ওকালতির কাজ করেন। মোহাম্মদ জামিলের পুত্র মুন্সী মোহাম্মদ আমীন লসকরপুর দেওয়ানী আদালতে মুন্সেফ বা বিচারকের পদ লাভ করেছিলেন। তিনি নিজ গুণে সরকারের নিকট থেকে এলাকার 'চৌধুরাই' লাভ করেন। তখন থেকে তাঁদের নামের সাথে 'চৌধুরী' পদবী যুক্ত হয়। বৃটিশ আমলে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের ন্যায় মাঝারি মানের জমিদারিও পরিচালনা করেন। আমীন চৌধুরী ছিলেন এলাকার একজন প্রতাপশালী ব্যক্তি। তবে এ পরিবারের বড় সাফল্য হলো তাঁরা সন্তানদের আরবি, ফার্সি ও উর্দুর

পাশাপাশি ইংরেজি ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। ফলে সরকারি-বেসরকারি চাকুরি লাভের পথ প্রশস্ত হয়। এ পরিবারের আমীন চৌধুরীর পুত্র আবদুল কাদির চৌধুরী সর্বপ্রথম ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে সরকারি চাকুরি গ্রহণ করেন। আবদুল কাদির চৌধুরী ১৮৫৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আসাম পুলিশ সার্ভিসে দারোগার চাকুরি লাভ করেন। ফলে তাঁর বাড়িটি এক সময় 'দারোগা বাড়ি' নামেও পরিচিত ছিল। তিনি সুনামের সাথে চাকুরি করে ১৯১১ সনে অফিসার ইন চার্জ(ওসি) হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪১ সনে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে ৫ পুত্র ও এক কন্যা রেখে যান। তাঁর সন্তানগণ সকলেই উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশ ও সমাজের কল্যাণে যথেষ্ট অবদান রেখে গিয়েছেন। নিজেরা আলোকিত হয়েছেন এবং অন্যদেরকেও আলোকিত করে গেছেন। বিশেষ করে শিক্ষা বিস্তারে এ পরিবারের অবদান অপরিসীম। তবে এ পরিবারের সবচেয়ে আলোকিত মানুষ ছিলেন মরহুম আবদুর রব চৌধুরী। তাঁদের কয়েকজনের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো যাতে বর্তমান প্রজন্ম অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে।

খান সাহেব আবদুর রব চৌধুরী(১৮৯১-১৯৬৬)

আবদুর রব চৌধুরী ১৮৯১ সনে হবিগঞ্জ জেলার সদর থানার দরিয়াপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল কাদির চৌধুরী এবং মাতার নাম খয়েরুন্নেছা চৌধুরী। খয়েরুন্নেছা চৌধুরী ছিলেন শহীদ বুদ্ধিজীবি ডাঃ আলীম চৌধুরীর আপন ফুফু।

তিনি পড়াশোনা শুরু করেন গ্রামের পাঠশালায়। তারপর চলে যান পিতার কর্মস্থল শিলচর। তিনি শিলচর গর্ভণমেন্ট হাই স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে এন্ট্রান্স পাশ করেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি সমগ্র আসাম প্রদেশের মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। ১৯১১ সনে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী এবং ১৯১৩ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। তখন গোটা আসামে ইংরেজিতে এমএ পাশ লোকের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএল এবং ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে তিনি বি.টি. ডিগ্রী লাভ করেন।

আবদুর রব চৌধুরী ১৯১৮ সনে বেঙ্গল এ্যাডুকেশন সার্ভিসে যোগ দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর প্রথম পদায়ন হয় ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে(বর্তমানে কবি নজরুল সরকারী কলেজ) ইংরেজির প্রভাষক হিসেবে। তারপর দেশের নামকরা কলেজসমূহে যথাক্রমে ঢাকা কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, রাজশাহী কলেজ, চট্টগ্রাম ইসলামিক ইন্টামিডিয়েট কলেজ, সিলেট এমসি কলেজে অধ্যাপনা করেন। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী কলেজে দু দফায় শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৩৬ সনে তিনি অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পান এবং রাজশাহী কলেজে বদলি হন। রাজশাহী কলেজে ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে প্রায় ৫ বছর দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৪১ সনে পদোন্নতি পেয়ে চট্টগ্রাম কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৪৩ সনে তিনি ঢাকা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে বদলি হন। অতঃপর বিভিন্ন সময়ে চট্টগ্রাম ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে যা বর্তমানে হাজী মুহসিন কলেজ (১৯৪৫), ঢাকা কলেজ (১৯৪৬) এবং দেশ বিভাগের পর এক সংকটকালে পাকিস্তান

সরকার ১৯৪৮ সনের মার্চ মাসে তাঁকে সিলেট এমসি কলেজর প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে ১৯৫০ সনের আগষ্ট মাসে অবসর গ্রহণ করেন।
সরকারি কলেজের চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি ঢাকা জজ কোর্টে ওকালতি করেন বেশ কয়েক বছর। বেশ কয়েকজন জুনিয়র আইনজীবী সমেত তিনি একটি চেম্বার খুলেছিলেন। আইনজীবী হিসেবেও তিনি যোগ্যতার পরিচয় দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার উপাচার্য W.A Jenkins বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহ পরিচালনার জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পদ সৃষ্টি করেন। তাঁর অনুরোধে আবদুর রব চৌধুরী ১৯৫৪ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসবে যোগ দেন। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। ইতঃপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের দপ্তর থেকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি পরিচালনা করা হতো। তিনি প্রায় ৫ বছর অত্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে ১৯৫৮ সনে পুরোপুরি অবসর গ্রহণ করেন।

প্রিন্সিপাল আবদুর রব চৌধুরী

তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। বাঙলা, ইংরেজি, আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। চল্লিশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংলিশ এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে তদানীন্তন ঢাকা ইসলামিক ইন্টামিডিয়েট কলেজে আধুনিক ইউরোপীয় নাটকের উপর কয়েকদিন ব্যাপী আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রিন্সিপাল আবদুর রব চৌধুরী অনেকগুলি মূলবান লেকচার প্রদান করেন। পরে সমস্ত লেকচারসমূহ পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য, নাটক ও কবিতার উপর তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন অনেকটা প্রচার বিমুখ। তিনি সুলেখক ছিলেন। তিনি ইংরেজি ও বাঙলা ভাষায় বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বেশ কয়েকটি বই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। সবগুলো বইয়ের নাম এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ ছাড়াও শেকস্‌পীয়র ও অন্যান্য ইংরেজ কবির উপর তাঁর গবেষণা গ্রন্থ একসময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল।
তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য দুটি বই হলো : a. Modern English Drama
b.Matriculation Translation.
তিনি বিশ শতকের কুড়ির দশকে ঢাকায় গড়ে উঠা 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কবি আবুল হোসেন প্রমুখের সাথে তিনিও এক সঙ্গে কাজ করেছেন বাঙালি মুসলমান সমাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য। সে গোষ্টির মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত সাহিত্য পত্রিকা 'শিখা'র সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। তাঁর আধুনিক মনমানসিকতার প্রমাণ মিলে তাঁর তিন মেয়েকেই তিনি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন এবং তারা সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তিন

মেয়েকেই সে যুগে চাকুরি (শিক্ষকতা) করতে উৎসাহিত করেছিলেন। নারী শিক্ষার প্রতি তাঁর এই নিষ্ঠা আজীবন অব্যাহত ছিল।
তিনি খুব ধৈর্যশীল ও প্রজ্ঞাবান মানুষ ছিলেন। ১৯১১ সনে মাত্র ২২ বছর বয়সে তাঁর বড় ভাই আবদুন নুর চৌধুরীর অকাল মৃত্যু, ১৯৫৫ সনে তাঁর স্ত্রী উম্মে আরেফা খাতুনের মৃত্যু এবং ১৯৬৫ সনে অপ্রাপ্ত বয়স্ক তিন সন্তান রেখে ১ম পুত্র মেজর আবদুল ওয়াহিদের মৃত্যুতে শোকাবহ পরিস্থিতি তৈরী হয়। পারিবারিক বিপর্যয়ে তিনি বিচলিত হয়েছিলেন বটে কিন্তু নিজ কর্তব্যে তিনি ছিলেন অবিচল। অনেক আত্নীয়-স্বজনের সন্তান তাঁর পুরান ঢাকার নাজিম উদ্দিন রোডের বাসায় অবস্থান করে তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও প্রত্যক্ষ সহায়তায় পড়াশোনা করেছেন। শহীদ বুদ্ধিজীবী ডাঃ আলীম চৌধুরী ছিলেন তাঁর আপন মামাতো ভাই। আলীম চৌধুরী আবদুর রব চৌধুরী সাহেবের বাসায় থেকে তাঁর তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করেছেন।
আবদুর রব চৌধুরী ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক, কর্তব্যপরায়ণ প্রশাসক, দায়িত্ববান অভিভাবক, স্নেহময় পিতা ও স্বামী। দুটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি বোমা হামলার কারণে সরকার চট্টগ্রাম কলেজকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তিনি তখন সে কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল। তিনি সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং সহকর্মীদের নিয়ে সরকারকে ছাত্র/ছাত্রী ও অভিভাবকদের সমস্যার কথা এবং জনমতের বিরূপতার কথা বুঝাতে সক্ষম হন। তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতি নাখোশ হন। তখন তাকে ইসলামিক ইন্টামিডিয়েট কলেজে বদলি করা হয়। তবু তিনি তাঁর যুক্তি থেকে সরে আসেননি। তিনি বিলাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তি লাভ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রীর পা ভেঙে যাওয়ায় তিনি বিলাত যাওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর অনুপস্থিতিতে সন্তানদের পড়াশোনার ক্ষতি হবে।
স্বভাবগতভাবে তিনি ছিলেন অনেকটা আত্মপ্রচারবিমুখ ও নিভৃতচারী। সভা-সমাবেশে যাওয়া তেমন পছন্দ করতেন না। জ্ঞান চর্চা এবং জ্ঞান বিতরণই তাঁর কাছে প্রাধান্য পেতো। জ্ঞানী লোকদের সাথে গল্প করতে পছন্দ করতেন। জ্ঞানতাপস ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ইঞ্জিনিয়ার ডঃ হাফিজ চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের স্বনামধন্য শিক্ষক প্রফেসর মাহমুদ হাসান (ইনি পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিলেন) বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীর ডেপুটি স্পীকার আবদুল হামিদ চৌধুরী (বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর বাবা), কবি সুফী জুলফিকার হায়দার (কবি নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও নজরুল জীবনীকার) প্রমুখ ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁরা প্রায়শই তাঁর নাজিমুদ্দীন রোডের বাসায় আড্ডায় বসতেন।
শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বৃটিশ সরকার তাঁকে 'খান সাহেব' খেতাব প্রদান করে সম্মানিত করে। ১৯৬৬ সনের মার্চ মাসে এই মহান শিক্ষাবিদ ঢাকা শহরে ইন্তেকাল করেন এবং আজিমপুর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে ঢাকা কলেজ ও সিলেট মুরারী চাঁদ কলেজে ছাত্র শিক্ষক কর্তৃক শোক সভার আয়োজন করা

হয়। স্পীকার আবদুল জব্বার খান শোক প্রকাশ করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন। পত্রপত্রিকায় গুরুত্বের সাথে মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাঁর স্মরণে এককালীন ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন দৈনিক অবজারভার পত্রিকায় নিবন্ধ লিখেন। পরবর্তীকালে তাঁর মেয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান উম্মে আয়েশা খাতুন চৌধুরী তাঁর পিতার নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Abdur Rob Chowdhury Chair for Mathematicai Physics এবং তাঁর পুত্র বিচারপতি আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী ও পৌত্রী প্রফেসর ডঃ নাসরীন ওয়াদুদ 'Abdur Rob Chowdhury Gold Madel বৃত্তি প্রবর্তন করেছেন। মরহুম আবদুর রব চৌধুরীর ৬ পুত্র ও ৩ কন্যা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত এবং উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । তাঁর নাতি/নাতনীরা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত এবং দেশে বিদেশে উচ্চ পদে আসীন থেকে নানাভাবে দেশ ও জাতির খেদমত করেছেন এবং করছেন।

মেজর আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী (১৯১৪-১৯৬৫)

বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর কীর্তিমান সামরিক অফিসার আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরীর জন্ম ১৯১৪ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি হবিগঞ্জের দরিয়াপুর গ্রামে । তিনি খান সাহেব আবদুর রব চৌধুরীর ১ম সন্তান।

মেজর আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী

আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী ১৯৩০ সনে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৩২ সনে ঢাকা কলেজ থেকে আইএ, ১৯৩৫ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে বিএ (অনার্স) এবং ১৯৩৬ সনে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন এবং একই বছর এলএলবি (প্রথমভাগ) পাশ করেন। জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা এথলেট ছিলেন। তিনি হকি, ক্রিকেট ও ফুটবলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি একজন চৌকস টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ক্রীড়া সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

আয়কর বিভাগে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার হিসেবে যোগ দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪১ সনের মে মাসে বৃটিশ সেনাবাহিনীর ইনফেন্ট্রি ডিভিশনে কমিশন লাভ করেন। পদাতিক বাহিনীর অফিসার হিসেবে মাদ্রাজ রেজিমেন্টে তাঁর পদায়ন হয়। যুদ্ধের সময় মাদ্রাজ রেজিমেন্টের সদস্য হিসেবে তিনি ইরাক, ইরান এবং

পদায়ন হয়। যুদ্ধের সময় মাদ্রাজ রেজিমেন্টের সদস্য হিসেবে তিনি ইরাক, ইরান এবং শ্রীলংকায় নিয়োজিত ছিলেন। ষ্টাফ ক্যাপ্টেন, কোয়াটার মাষ্টার জেনারেল ও জেনারেল ষ্টাফ অফিসার হিসেবে বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর দিল্লী, পুনা সাব-এরিয়া ও বিভিন্ন ব্রিগেডে কাজ করেছেন। ১৯৪৬ সনে বৃটিশ আর্মিতে তিনি মেজর পদে পদোন্নতি পান। যুদ্ধ শেষে নিজ এলাকা হবিগঞ্জে আসলে এলাকাবাসী তাঁকে বীরোচিত সংবর্ধনা প্রদান করে।

১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের পর তিনি পাকিস্তান আর্মিতে যোগ দেন এবং ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে মেজর হিসেবে পদায়ন করা হয়। তাঁকে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১ম ব্যাটেলিয়নের প্রশিক্ষণ কোম্পানির ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তখন সদ্য স্বাধীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালি অফিসারের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। তৎকালীন বাঙালি অফিসার মেজর গনি, মেজর এমএজি ওসমানী এবং তিনি মিলে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে একটি শক্তিশালী রেজিমেন্ট হিসেবে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৮ সনে প্রশিক্ষণ ইউনিট পরিচালনা এবং এর মর্যাদা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল পেটারসনের সাথে মতবিরোধ দেখা দেয়। কমান্ডিং অফিসার সাব-এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল আইয়ুব খানের বরাবরে বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ করেন। আইয়ূব খান ইতঃপূর্বে ১৯৪৮ সনের মার্চ মাসে এক সেনা সমাবেশে পূর্ব বঙ্গের মুসলমানদের সম্পর্কে অবমাননাকর বক্তব্য দিলে সমাবেশে উপস্থিত মেজর ওয়াহিদ চৌধুরী প্রতিবাদ করেন। একই বছর এপ্রিল মাসে তেজগাঁও অফিসার্স মেসে অনুষ্ঠিত অফিসার্স কনফারেন্সে পূর্ব বঙ্গের রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করেন। সেখানেও মেজর ওয়াহিদ এধরনের মন্তব্য না করার জন্য অনুরোধ করেন। ফলে তখন থেকেই তিনি মেজর ওয়াহিদের প্রতি বিরূপ ছিলেন। সুযোগ পেয়ে তাঁকে অপদস্থ করার পথ বের করেন। তখন তাঁর লে.কর্ণেল হিসেবে পদোন্নতির সময়। তাঁকে জব্দ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। তাঁর বিরুদ্ধে ইনকোয়ারী শুরু করা হয় এবং তাকে বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে ঝিলামে অবস্থিত পাঞ্জাব রেজিমেন্টোল সেন্টারে বদলি করা হয়। সাব-এরিয়া কমান্ডার তাঁকে নতুন কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে অনেকটা অন্তরীণ করে রাখে। ফলস্বরূপ ১৯৪৮ সনের ২রা জুলাই তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন। প্রতিশ্রুতিশীল সামরিক কর্মকর্তার ভবিষ্যত মাঝপথেই যেন শেষ হয়ে যায়।

১৯৪৯ সনের জুলাই মাসে আবদুল ওয়াহিদ চৌধুরী পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল বরাবরে অবিচারের প্রতিকার চেয়ে তথ্যবহুল, যুক্তিপূর্ণ এবং আবেগঘন ৪ পৃষ্ঠার এক দীর্ঘ পত্র লিখেন। পত্রের অনুলিপি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্জাকে প্রদান করেন। তাঁর প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে সরকারের নিকট তা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ফলে ১৯৫২ সনে পাকিস্তান সরকার তাঁকে পুলিশ সার্ভিসে নিয়োগ প্রদান করেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে ১৯৫৮ সন

পর্যন্ত ঢাকার শিল্পাঞ্চলে কাজ করেন এবং একজন দক্ষ পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তারপর বদলি হন কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে। সেখান থেকে বদলি করা হয় চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে। পুলিশ বাহিনীতেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন। পুলিশ সুপার হিসেবে পদোন্নতির সময় তাঁর চাকুরি জীবনে নতুন সংকট দেখা দেয়। ফিল্ড মার্শাল আইয়ূব খান তখন পাকিস্তানের শাসক এবং দণ্ডমুণ্ডের কর্মকর্তা। গোয়েন্দা মারফত জানতে পারেন মেজর আবদুল ওয়াহিদ চৌধুরী পুলিশ সার্ভিসে কর্মরত আছেন। পুরোনো বিরোধের জের ধরে তার বিরুদ্ধে আবার শুরু হয় ষড়যন্ত্র। দুর্ভাগ্য যেন তাঁর পিছু ছাড়ে না। ফলে সেখানেও তার কাজ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৬২ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি পুলিশ বিভাগ থেকে পদত্যাগ করেন। প্রতিজ্ঞা করেন পাকিস্তান সরকারের অধীনে আর কোন চাকুরি করবেন না। আবদুল ওয়াহিদ চৌধুরী ছিলেন সৎ, নির্ভীক, সাহসী, স্পষ্টবাদী ও স্বাধীনচেতা মানুষ। তাঁর এই অনন্য সাধারণ গুণের জন্য যদিও তাকে অনেক সময় চরম খেসারত দিতে হয়েছে তবু তিনি আত্মমর্যাদার প্রতি সজাগ ছিলেন। আবদুল ওয়াহিদ চৌধুরীর বিয়ে হয় উচাইল পরগনার ব্রাহ্মণডোরা গ্রামে মামাতো বোন উম্মে আজিজা চৌধুরীর সাথে । তিনি তিন পুত্র সন্তানের জনক ছিলেন। তাঁর ১ম পুত্র আব্দুল জলিল চৌধুরী ঢাকা কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করে ন্যাশনাল টী কোম্পানীর কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরি করেন, ২য় পুত্র প্রফেসর আবদুল নাঈম চৌধুরী বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে বিএ(অনার্স) ও এমএ ডিগ্রী লাভ করে প্রথমে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের বাঙলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। পরে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি কলেজে যোগ দেন। সর্বশেষে নারায়নগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজের প্রফেসর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ৩য় পুত্র আবদুল মুকিত চৌধুরী ছিলেন ব্যাংকার। আজ তাঁরা কেউ বেঁচে নেই। আবদুল জলিল চৌধুরী ১৯৭১ সনে মাধবপুর থানার জগদীশপুর চা বাগানে কর্মরত ছিলেন। এলাকাটি ছিল পাকবাহিনী এবং তাদের দোসরদের চারণভূমি। জলিল চৌধুরী নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেন। অনেক সময় তাঁদেরকে খাদ্য ও আশ্রয় দিয়ে সহায়তা করেছেন। বিপদের সময় আগাম তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। তাঁর মেয়ে জামাতা মিজানুল হক চৌধুরী অর্থ প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান এমপির একান্ত সচিব থেকে বর্তমানে বান্দরবান জেলার জেলা প্রশাসক (ডিসি)।

আবদুল ওয়াহিদ চৌধুরী ১৯৬৫ সনে মাত্র ৫১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং আজিমপুর কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর মত দেশপ্রেমিক সামরিক কর্মকর্তার সংখ্যা তৎকালে খুবই বিরল ছিল।

বিচারপতি আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী(১৯২০-২০০৯)

আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী ১৯২০ সনে পিতার কর্মস্থল ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খান সাহেব আবদুর রব চৌধুরীর ২য় পুত্র। আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯৩৮ সনে ম্যাট্রিক, ১৯৪০ সনে রাজশাহী কলেজ থেকে আইএ পাশ

করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে ১৯৪৩ সনে বি এ(অনার্স) ও ১৯৪৪ সনে এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএল ডিগ্রী অর্জন করেন।

বিচারপতি আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী

তিনি সরকারে পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টে মহকুমা পাবলিসিটি অফিসার হিসেবে যোগ দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রথম কর্মস্থল ছিল নিজ শহর হবিগঞ্জে। কিছুদিন চাকুরি করার পর ঢাকা জজকোর্টে আইন পেশায় যোগ দেন। ১৯৫০ সনে হামিদুল হক চৌধুরীর জুনিয়র হিসেবে ঢাকা হাইকোর্ট বারে যোগদান করেন। আইন পেশায় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও বিচারপতি সৈয়দ এ বি মাহমুদ হোসেন তাঁর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি হাইকোর্টের সিনিয়র এডভোকেট হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। তিনি সুপ্রিমকোর্ট বার এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। মামলা পরিচালনায় তিনি দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। সুপ্রিমকোর্ট বারের নেতৃস্থানীয় আইনজীবী ছিলেন। ১৯৭৭ সনে তৎকালীন চীফ জাস্টিজ সৈয়দ এ বি মাহমুদ হোসেন সাহেবের একান্ত আগ্রহে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের সামরিক সরকার হাইকোর্টকে বিকেন্দ্রীকরণ করলে তিনি বরিশাল হাইকোর্ট বেঞ্চের বিচারক নিযুক্ত হন । অবশ্য ১৯৮৮ সনে বিকেন্দ্রীকরণ আদেশ অবৈধ ঘোষিত হলে তিনি পুনরায় ঢাকা হাইকোর্টে ফিরে আসেন। ১৯৮৯ সনে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ ও বিচক্ষণ বিচারক ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তাঁকে সাংবাদিক রোয়েদাদ বোর্ডের চেয়ারম্যান, শ্রম আপীল আদালতের চেয়ারম্যান এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট ঘটনায় এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়।

ছাত্রজীবন থেকেই খেলাধুলার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি হকি, ক্রিকেট ও ফুটবলে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ব্লু ছিলেন। তিনি একজন নামকরা টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন। ঢাকা টেনিস ক্লাবের সদস্য ছিলেন এবং সেখানে নিয়মিত টেনিস খেলতেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তাঁর টেনিস পার্টনার ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি গলফ খেলতেন। সদরে ইস্পাহানী সাহেব তাঁর গলফ খেলার সঙ্গী ছিলেন।

২০০৯ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর স্ত্রী শামসুন্নাহার চৌধুরী ১৯৭৮ সনে আকস্মিকভাবে ইন্তেকাল করেন। একমাত্র পুত্র জামিল চৌধুরী ১৯৭৪ সনে স্কুলে পড়া অবস্থায় ইন্তেকাল করে। একমাত্র মেয়ে ডঃ নাসরীন ওয়াদুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজী বিভাগের অধ্যাপক।

প্রফেসর ড: নাসরীন ওয়াদুদ (১৯৫৭)

নাসরীন ওয়াদুদ ১৯৫৭ সনে পিতার কর্মস্থল ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিচারপতি আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী ও শামসুন্নাহার চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ সন্তান ।

নাসরীন ওয়াদুদ ১৯৭২ সনে আজিমপুর গালর্স হাই স্কুল থেকে এসএসসি এবং ১৯৭৪ সনে হলিক্রস কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এইচএসসি পাশ করেন । উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পেয়েছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগ থেকে বিএসসি (অনার্স) ও এমএসসি ডিগ্রী লাভ করেন যথাক্রমে ১৯৭৯ ও ১৯৮১ সনে। তিনি মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ঢাকা ইউনিভার্সিটি মেরিট স্কলারশীপ এবং ১৯৯০ সনে স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য কমনওয়েলথ স্কলারশীপ লাভ করেছিলেন। ১৯৯৬ সনে A study of Occupational Stress and Other Psychological Aspects of Managerial Employees শীর্ষক অভিসন্ধর্ভ রচনা করে তিনি দিল্লী ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন ।

ড. নাসরীন ওয়াদুদ

১৯৮৩ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি দীর্ঘদিন মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি রোকেয়া হলের হাউজ টিউটর হিসেবেও নিয়োজিত ছিলেন। ড. নাসরীন ওয়াদুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও অন্যান্য বেসরকারি ইউনিভার্সিটি ও ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনা করেছেন। ২০০৪ সন থেকে ২০০৭ পর্যন্ত তিনি ইষ্ট ওয়েষ্ট ইউনভার্সিটির সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারপার্সন হিসেবে কাজ করেছেন। তাছাড়া খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে তিনি ১৯৯৯ সন থেকে ২০০৪ সনের আগষ্ট পর্যন্ত নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে, ২০০২ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Business Administration (IBA) এবং BGMEA Institute of Design Technology (BIFT) তে কাজ করছেন। প্রায় দীর্ঘ ৩৫ বছরের শিক্ষকতা জীবনের অভিজ্ঞ এই শিক্ষক প্রধানত Industrial psychology, Organizational Behavior, Consumer Behavior, Human Resource Management, Sport psychology প্রভৃতি ক্ষেত্রে গবেষণা করছেন। কনসালট্যান্ট হিসেবে তিনি BRAC, ICDDRB, UNICEF, BKSP AMCL,

DEEP ইত্যাদি সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করেছেন। দেশে বিদেশে অনুষ্ঠিত অনেক জাতীয়, আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক সভা, কনফারেন্স, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেছেন, প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন এবং মডারেটর হিসেবে কাজ করেছেন। মনোবিজ্ঞানী হিসেবে তিনি বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সংস্থায় কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করেছেন। Bangladesh National Women Lawyers Association কর্তৃক পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্র (Shelter Homes) ও বিচার বিভাগীয় হেফাজতে (Judicial custody) থাকা নারী ও শিশুদের সমস্যা নিয়ে তিনি কাজ করেছেন|

তার লেখা প্রায় ৩২টি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ দেশী-বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া আবদুল খালেক সম্পাদিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত Job Satisfaction and Work in the industry নামক গ্রন্থে তাঁর Perceived Importance of Job Facts and overall Job of Industrial Supervisors শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি স্থান পায়। তিনি Psychological Well-Being of Rural Women: Developing Measurment Tools. নামক গ্রন্থটির লেখক যা BRAC, ICDDRB কর্তৃক যৌথভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আবদুল খালেক এবং এ. ইউ. আহমদ সম্পাদিত এবং ইউপিএল কর্তৃক প্রকাশিত 'স্মৃতি ও বিস্মৃতি' নামক গ্রন্থে তিনি লেখেন 'মন ও মনোবিজ্ঞান ' শীর্ষক অধ্যায়টি ।

প্রফেসর নাসরীন ওয়াদুদ মনোবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ জড়িত আছেন। তিনি SAARC Association of psychologist(SAAP) এর ট্রেজারার, Bangladesh Psychological Association(BPA) এর সেক্রেটারী জেনারেল, Bangladesh Journal of Psychology (১৯৯৮-১৯৯৯)এর সহ-সম্পাদক ছিলেন।

নাসরীন ওয়াদুদ ও তাঁর পিতা বিচারপতি আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী যৌথভাবে খান সাহেব আবদুর রব চৌধুরীর নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আবদুর রব চৌধুরী গোল্ড মেডেল ' প্রবর্তন করেছেন। উক্ত ট্রাষ্ট ফান্ডের মাধ্যমে প্রতিবছর একজন সর্বোচ্চ মেধার অধিকারী শিক্ষককে উচ্চ শিক্ষার জন্য গবেষণা বৃত্তি প্রদান করা হয়। খুব সহসা তিনি তাঁর পৈত্রিক বাড়ি দরিয়াপুরে তার পিতা-মাতার নামে 'আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী-শামসুন্নাহার স্মৃতি বিদ্যালয় ' স্থাপন করতে যাচ্ছেন।

পারিবারিক জীবনে ড: নাসরীন এক ছেলে ও এক মেয়ের জননী। তাঁর স্বামী ড: মঈনুল ইসলাম শরীফ একজন নামকরা গবেষক। তিনি বেসরকারি গবেষণা সংস্থায় পরিবেশ, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, রি-সেটেলমেন্ট ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন।

প্রিন্সিপাল আব্দুল মতিন চৌধুরী(১৯২৬-২০০৩)

আব্দুল মতিন চৌধুরী ১৯২৬ সনে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খান সাহেব আবদুর রব চৌধুরীর ৩য় পুত্র। পিতার বদলির চাকুরির সুবাদে আব্দুল মতিন চৌধুরীর স্কুল

জীবন কাটে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। তিনি সেন্ট গ্রেগরী স্কুল, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল ও ঢাকা মুসলিম হাই স্কুলে পড়াশোনা করেন। ১৯৪২ সনে তিনি ঢাকা মুসলিম হাই স্কুল থেকে মেট্রিক, ১৯৪৪ সনে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে আইএ পাশ করেন। তিনি ১৯৪৭ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে বিএ(অনার্স) ও ১৯৪৮ সনে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন।

প্রিন্সিপাল আব্দুল মতিন চৌধুরী

আব্দুল মতিন চৌধুরী ১৯৫০ সনে হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৫২ সনে ইস্ট পাকিস্তান এডুকেশন সার্ভিসে প্রভাষক হিসেবে সিলেট মুরারী চাঁদ কলেজের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম পদায়ন হয়। ১৯৫৮ সনে বদলি হন চট্টগ্রাম কলেজে। সেখানে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৪ সনের অক্টোবর মাসে সরকারি বৃত্তি পেয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত গমন করেন। কিন্তু নিজের শারীরিক অসুস্থতা ও আকস্মিকভাবে পিতার মৃত্যুর কারণে কোর্স অসমাপ্ত রেখেই দেশে ফিরে আসেন এবং বদলি হয়ে পুনরায় মুরারী চাঁদ কলেজে যোগ দেন। আব্দুল মতিন চৌধুরী মুরারী চাঁদ কলেজে ১৯৭০ থেকে ১৯৭৬ সনের জুন মাস পর্যন্ত ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন। তারপর তিনি সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক (ট্রেনিং এন্ড ম্যানপাওয়ার) হিসেবে ঢাকায় শিক্ষা ভবনে বদলি হন। তারপর জগন্নাথ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ সনে তিনি সিলেট সরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজের (তখন কলেজটি এমসি ইন্টামিডিয়েট কলেজ নামে পরিচিত ছিল) প্রিন্সিপাল হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। সেখানে দায়িত্ব পালনের পর ১৯৮০ সনের জুন মাসে সরকার তাঁকে তোলারাম কলেজে প্রিন্সিপাল হিসেবে নিয়োগ দান করে। ১৯৮৩ সনে তিনি ফিরে আসেন তাঁর প্রিয় ক্যাম্পাস এমসি কলেজে প্রিন্সিপাল হিসেবে। তবে তখন চাকুরি জীবনের শেষদিকে। সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে ঐ সনের ডিসেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করেন। শিক্ষকতা জীবনে তিনটি নামকরা কলেজের প্রিন্সিপাল, দুটি কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

তাঁর পিতা খান সাহেব আবদুর রব চৌধুরীও বিভাগোত্তরকালে এমসি কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। পিতা-পুত্র একই কলেজের প্রিন্সিপাল হওয়ার দুর্লভ নজির খুব বেশি নেই। অবশ্য এ কলেজেই আরেকবার ঘটেছিল প্রিন্সিপাল হাসান ওয়ারেস সাহেবের ক্ষেত্রে। তাঁর পিতা স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ প্রফেসর আবু হেনাও পঞ্চাশের

দশকের শুরুতে এমসি কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন।

আবদুল মতিন চৌধুরী ছাত্রজীবন থেকেই ভালো আবৃত্তিকার এবং নাট্যকর্মী ছিলেন। স্বাধীনতা- উত্তর ছাত্র সমাজের অবক্ষয় রোধে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। সে সময় তিনি *একতারা নাট্যগোষ্ঠীর* সভাপতি হিসেবে অসামান্য ভূমিকা পালন করেন।

২০০৩ সনের ৩০ অক্টোবর আবদুল মতিন চৌধুরী ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।

আবদুল মতিন চৌধুরী সুখময় পারিবারিক জীবনের অধিকারী ছিলেন। তিনি ১৯৫৫ সনে সিলেটের গোলাপগঞ্জ থানার পূর্ব ভাদেশ্বর গ্রামের ডা: আবদুল মুমিত চৌধুরীর কন্যা রাফিয়া চৌধুরীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। আবদুল মুমিত চৌধুরী ছিলেন তখন ময়মনসিংহ জেলার সিভিল সার্জন। এই দম্পতির দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। বড় মেয়ে রুমানা চৌধুরী উর্মি (১৯৫৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে এল,এল, বি (অনার্স) ও এল, এল, এম ডিগ্রী অর্জন করে প্রথমে সিগমা হুদা ও পড়ে ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ সাহেবের জুনিয়র হিসেবে প্রায় ৭ বছর আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে তাঁর স্বামী এ্যাডভোকেট মঈনুল আহসানসহ দুই মেয়ে লুসা আহসান ও মুকাত্তা আহসানকে নিয়ে কানাডার টরেন্টো শহরে বসবাস করছেন।

আবদুল মতিন চৌধুরীর ২য় সন্তান রুবাবা চৌধুরী (১৯৫৭) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগ থেকে বিএ(অনার্স) ও এমএ ডিগ্রী অর্জন করে বর্তমানে পরিবারসহ কানাডার টরেন্টো শহরে বসবাস করছেন। তিনি দীর্ঘদিন একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে কাজ করেছেন। বর্তমানে সোস্যাল ওয়ার্কার। তাঁর স্বামী গোলাম রব্বানী একজন বিশিষ্ট ব্যাংকার। তাঁদের দুই ছেলে সামির রব্বানী ও ছালেহ রব্বানী কানাডার ফাইন্যান্সিয়েল সেক্টরে উচ্চ পদে কাজ করছেন।

আবদুল মতিন চৌধুরীর বড় ছেলে নেহাল হাসনাইন (১৯৬৩) সত্তরের দশকের শেষে ও আশির দশকে বাংলাদেশ ক্রিকেট জাতীয় দলের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগ থেকে বিএ(অনার্স) ও এমএ ডিগ্রী অর্জন করে ব্যাংকার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। বর্তমানে তিনি কানাডার টরেন্টোতে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানে সুপারভাইজার পদে কর্মরত আছেন। তাঁর স্ত্রী নিগার দুর্দনা মহিলা ক্রিকেটে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁদের প্রথম সন্তান সাবাত হাসনাইন ওয়াটারলু ইউনিভার্সিটি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে বহুজাতিক কোম্পানীতে প্রকৌশলী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। অন্য সন্তান সামিহা চৌধুরী কানাডার একটি ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছেন।

শিহাব হাসনাইন প্রিন্সিপাল আবদুল মতিন চৌধুরীর কনিষ্ঠ সন্তান। তিনি পড়াশোনা করেন সিলেট গভর্ণমেন্ট হাই স্কুল,ঢাকা কলেজ ও আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে। ১৯৮৩ সনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পদাতিক ডিভিশনে কমিশন লাভ করেন। প্রায় ১০ বছর চাকুরি করে মেজর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি

শেভরন (বাংলাদেশ)এর ডাইরেক্টর(সিকিউরিটি) হিসেবে কাজ করছেন। তাঁর স্ত্রী নওশীন লায়লা একজন বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী। নওশীন লায়লা শিল্পী হিসেবে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সেরা শিল্পী নির্বাচিত হয়েছিলেন। বর্তমানে পিএইচ.ডি করছেন।

প্রফেসর ডঃ আবদুল লতিফ চৌধুরী (১৯৩৩-২০১৩)

আবদুল লতিফ চৌধুরীর জন্ম পিতার কর্মস্থল ঢাকায় ১৯৩৩ সনের ১ লা জানুয়ারি। তিনি প্রিন্সিপাল খান সাহেব আবদুর রব চৌধুরীর ৪র্থ পুত্র। আবদুল লতিফ চৌধুরী অধ্যয়ন করেন সেন্ট গ্রেগরী স্কুল, ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৫৩ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১ম শ্রেণিতে ১ম হয়ে বিএসসি (অনার্স) এবং ১৯৫৪ সনে এমএসসি ডিগ্রী লাভ করেন। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে গ্রেফতার হয়েছিলেন। সাব-সিডিয়ারী বিষয়ের কয়েকটি পরীক্ষা জেলখানায় বসেই দিতে হয়েছিল।

ড. আব্দুল লতিফ চৌধুরী   Jutta Kauch

উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চতর গবেষণা

(a) German Exchange Scholarship পেয়ে উচ্চ শিক্ষার্থে তদানীন্তন পশ্চিম জার্মানি গমন করেন। তিনি বার্লিনের Freie University থেকে Theoritical Physics এর উপর গবেষণা করে ১৯৬০ সনে পিএইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

(b) ১৯৬০ সনের মে মাসে post-doctorate Research Fellowship পেয়ে বার্লিনের Fritz-Haber-Institute এ ১৯৬০ সনের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত গবেষণা করেছেন।

(C) কলম্বো প্লান ট্রেনিং গ্র্যান্ট এর অধীনে Research Assistenship পেয়ে লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজে Theoritical Physics এর উপর ১৯৬০ সনের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৬১ সনের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত উচ্চতর গবেষণা করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষকতা জীবন

(ক) আবদুল লতিফ চৌধুরী পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পেশা হিসাবে শিক্ষকতাকেই বেছে নেন এবং লেকচারার হিসেবে ১৯৫৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে যোগ দেন।

(খ) জার্মানিতে পিএইচ.ডি কোর্সে গবেষণারত থাকার সময় Freie Universit এর Theoritical Physics বিভাগের অধ্যাপকের Assistant হিসেবে অধ্যাপনা করেন ১৯৫৮ সনের নভেম্বর থেকে ১৯৬০ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত।

(গ) ১৯৬১ সনের নভেম্বর মাস থেকে ১৯৬৬ সনের আগষ্ট পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সিনিয়র লেকচারার হিসেবে অধ্যাপনা করেন।

(ঘ) ১৯৬৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে State College, Elizabeth City, North Carolina এর গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে এসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে যোগ দেন।

(ঙ) ১৯৬৮ সনের আগষ্ট থেকে ১৯৬৮ সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সিনিয়র লেকচারার হিসেবে অধ্যাপনা করেন।

(চ) ১৯৬৯ সনের জানুয়ারি মাসে তিনি রিডার হিসেবে পদোন্নতি পান এবং আগষ্ট পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।

(ছ) ১৯৬৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি State University, Elizabeth City, North Carolina এর গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে এসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৭৩ সনের জুলাই মাস পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন।

(জ) ১৯৭৩ সনের আগষ্ট মাসে আবদুল লতিফ চৌধুরী একই ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর পদে পদোন্নতি পান এবং দীর্ঘদিন সেখানে অধ্যাপনা করে ২০০৩ সনে অবসর গ্রহণ করেন।

আবদুল লতিফ চৌধুরীর কর্মজীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা কর্মে নিয়োজিত থেকে। মাঝে ১৯৬৮ সনের আগষ্ট থেকে ১৯৬৯ সনের আগষ্ট মাস পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসেছিলেন। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছিলেন। তৎকালীন পাকিস্তান আনবিক শক্তি কমিশনে তিনি চাকুরি লাভ করেছিলেন কিন্তু যোগদান করেননি।

তিনি আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটি এবং নর্থ ক্যারোলিনা সোসাইটি অব সায়েন্টিস্ট এর মেম্বার ছিলেন। নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালামের জুনিয়র হিসেবে কাজ করেছেন বেশ কিছু সময়। প্রফেসর সালাম তাঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং পদার্থ বিজ্ঞানে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তির জন্য উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। নোবেল বিজয়ী ড. আব্দুস সালামের আরেকজন ঘনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন হবিগঞ্জের আরেক কৃতি সন্তান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যাপক মরহুম ড. মোঃ আব্দুল কুদ্দস (১৯৪৮-২০০৬)। মূলত একারণে ড. আব্দুল কুদ্দুসের সাথে ড.

আব্দুল লতিফ চৌধুরী ও তার ভাই বিচারপতি আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরীর সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিল।

ড. আব্দুল লতিফ চৌধুরী ছিলেন একজন উচুঁ মাপের শিক্ষক, বিজ্ঞানী এবং গবেষক। মার্কসবাদী দর্শন দ্বারা তিনি প্রভাবিত ছিলেন গভীরভাবে। তিনি একজন বস্তুবাদী অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার মানুষ ছিলেন। তাঁর আস্থা ছিল মানবতাবাদে।

তাঁর অসংখ্য উন্নতমানের প্রকাশনা রয়েছে। তন্মধ্যে :

1. A Variational Calculation of Elastic Scattering of Electrons by Helium (1996)
2. Unitary Symmetry (1965)
3. U-and V- Sectors of Brozan-Lee Model (1973)
4. UN-Sector and Compositeness Conditions in Brozan-Lee model (1974)
5. Callan-Symanzik Equation in Lee Model (1975)
6. Magnetic Moments of Charmed Baryons (1976)
7. Magnetic Moments of Charmed Vector Bosons (1977)
8. Symmetry behavior of Higher powered Self interacting Scalar Field at finite Temperature (1988)
9. Wormholes Created by a Scalar Field interacting with the gravitational AXITION (1992)
10. Time Loops from a Higher Order Gravitational Theory (1996)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি ঐতিহাসিক রাষ্টভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির দপ্তর সম্পাদক ছিলেন। ২১ শে ফেব্রুয়ারির হত্যাযজ্ঞের পর পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য তিনিসহ নেতৃস্থানীয় ছাত্ররা শান্তিনগরের একটি বাসায় গোপনে মিলিত হন। কিন্তু তাদের মধ্যে সরকারের চর থাকায় সভার কথা গোয়েন্দা পুলিশ জেনে যায় এবং বাসা ঘেরাও করে পুলিশ তাঁকেসহ আরো অনেককে গ্রেফতার করে এবং প্রায় ৩ মাস কারাগারে আটক রাখে। গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছিল ১৯৫২ সনের ৭ মার্চ তারিখে। এ ঘটনা থেকে তাঁর মধ্যে সরকার বিরোধী চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং ধীরে ধীরে বামপন্থী রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। বাকী জীবন বস্তুবাদী দর্শনের প্রতি একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৭১ সনে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষকদের নিয়ে প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি জার্মান বংশোদ্ভূত jutta Kausch কে বিয়ে করেন। তিনি পশ্চিম জার্মানিতে পিএইচ.ডি করার সময় jutta এর সাথে পরিচয় হয় এবং তাঁকে পছন্দ করেন। jutta Kausch ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৮ সনে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁদের দুই ছেলে Kadjol Chowdhury এবং Marcel Chowdhury পিতার ন্যায় অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়েছেন। একজন প্রকৌশলী এবং অপরজন

পাইলট হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত আছেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

ড. আব্দুল লতিফ চৌধুরী ২০১৩ সনের মার্চ মাসে ৮০ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের এলিজাভেথ শহরে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর ইচ্ছে অনুসারে সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

আবদুল খালেক চৌধুরী (১৯৩৪)

আবদুল খালেক চৌধুরী ১৯৩৪ সনে ঢাকা শহরের দেওয়ান বাজারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খান সাহেব আবদুর রব চৌধুরীর ৫ম পুত্র। আবদুল খালেক চৌধুরী ১৯৫২ সনে সেন্ট গ্রেগরী স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক এবং ১৯৫৪ সনে ঢাকা কলেজ থেকে আইএ পাশ করে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

আব্দুল খালেক চৌধুরী

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে পড়াশোনার চেয়ে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ ছিল বেশি। অবশ্য খেলাধুলার প্রতি টান তৈরীর ঐতিহ্য লাভ করেছিলেন পারিবারিকভাবেই। তাঁর বড় অপর চার ভাইও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা এথলেট ছিলেন। ক্রিকেট, ফুটবল, বাস্কেটবল ও ভলিবল খেলায় তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল এবং এসকল খেলায় তিনি বেশ পারদর্শী ছিলেন। দিনের একটি উল্লেখযোগ্য সময় খেলাধুলায় ব্যয় করতেন। তখনকার সময়ে পাকিস্তান স্পোর্ট কাউন্সিল দেশের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ইন্টার প্রভিন্স প্রতিযোগিতার আয়োজন করতো। নিখিল পাকিস্তান ফুটবল টীমে তিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন একাধিকবার। ১৯৫৫ সনে ইষ্ট পাকিস্তান ফুটবল দলের সদস্য হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান গমন করেন। খেলায় তারা ভাওয়ালপুর দলকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৫৯ সনে তিনি ইষ্ট পাকিস্তান ক্রিকেট টীমের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এশিয়ান গেমসে খেলার জন্য পাকিস্তান টীমে মনোনীত হয়েছিলেন কিন্তু ইঞ্জুরীর জন্য খেলতে পারেননি । স্কুল জীবনে সেন্ট গ্রেগরী স্কুলের খেলাধুলায় তিনি নেতৃত্ব প্রদান করেছেন এবং আন্তঃস্কুল খেলায় তারা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন অনেকবার। স্বাধীনতার পর ১৯৭৭-১৯৭৮ মেয়াদে তিনি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। সামগ্রিকভাবে দেশের ক্রীড়া উন্নয়নে তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। অবসর জীবনেও খেলাধুলা তাঁকে আকর্ষণ করে। সুযোগ পেলেই অশীতিপর এই তরুণ টেলিভিশনে খেলা উপভোগ করেন!

খেলাধুলায় বেশি মেতে থাকায় পড়াশোনায় কিছুটা পিছিয়ে পড়েন। ১৯৫৮ সনে তিনি জগন্নাথ কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন এবং ১৯৬০ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি ১৯৬৩ সনে পাকিস্তান হাবীব ব্যাংকে অফিসার হিসেবে যোগ দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ব্যাংকের শ্রীমঙ্গল ও রংপুর শাখায় দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন। দেশ স্বাধীন হলে হাবীব ব্যাংককে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় এবং নাম হয় অগ্রণী ব্যাংক। তিনি চাকুরিতে বহাল থাকেন এবং নতুন কর্মস্থল হয় ঢাকায়। ১৯৮৯ সনে উপ-মহাব্যবস্থাপক পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। আব্দুল খালেক চৌধুরী বিয়ে করেন তার চাচা এ্যাড আব্দুস সোবহান চৌধুরীর কন্যা ডলি চৌধুরীকে।

বর্তমানে তিনি ঢাকায় বসবাস করছেন। আবদুল খালেক চৌধুরীর ছেলে তানিম চৌধুরী দেশে-বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে বর্তমানে আয়ারল্যান্ডে কর্মরত আছেন। মেয়ে তানিয়া আরেফা চৌধুরী এমএ। তার স্বামী মাহমুদ হাসান বাংলাদেশ এয়ারফোর্সে গ্রুপ ক্যাপ্টেন।

ডা: আবদুর রাকীব চৌধুরী (১৯৩৯)

খান সাহেব আবদুর রব চৌধুরী সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র প্রখ্যাত চিকিৎসক ডা: আবদুর রকীব চৌধুরী ১৯৩৯ সনে পুরান ঢাকার নাজিমুদ্দীন রোডে দেওয়ান বাজারের বাসায় জন্মগ্রহণ করেন। আবদুর রাকীব চৌধুরী পড়াশোনা করেন ঢাকার সেন্ট গ্রেগরী স্কুল, নটরডেম কলেজ ও ঢাকা মেডিকেল কলেজে।

তিনি ১৯৫৪ সনে সেন্ট গ্রেগরী স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক এবং ১৯৫৬ সনে নটরডেম কলেজ থেকে আইএসসি পাশ করেন। ১৯৬১ সনে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এমবিবিএস পাশ করেন।

ডা. আব্দুর রাকিব চৌধুরী

১৯৬২ সনের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১৯৬৩ সনের জুন মাস পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রফেসর এসএম রব এবং প্রফেসর ফজলে রাব্বীর (একাত্তর সনে শহীদ) অধীনে হাউজ ফিজিশিয়ান হিসেবে কাজ করেন। কিছুদিন চাকুরি করার পর তাঁদের পরামর্শে উচ্চ শিক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। ১৯৬৩ সনের জুলাই থেকে ১৯৬৭ সনের জুন পর্যন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও ভ্যালী হসপিটাল, কলম্বাস হাসপাতাল চিকাগো, লুইস গেইল হসপিটাল

রোয়ানকো, লুইস আমেরিকান ওয়িস মেমোরিয়্যাল হসপিটাল চিকাগো ইত্যাদিতে ইন্টারন্যাল মেডিসিনের উপর ইন্টার্নিশীপ ও রেসিডেন্সি করেছেন। জুলাই ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৮ সনের জুন পর্যন্ত লুইস আমেরিকান ওয়িস মেমোরিয়্যাল হসপিটাল চিকাগো তে গেষ্ট্রোইন্টারোলজির ফেলো হিসেবে কাজ করেছেন।

বেশ কয়েক বছর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করার পর তিনি কানাডা গমন করেন। মন্ট্রিলের কুইন মেরী ভেটারান্স হসপিটালে মেডিসিন বিভাগে সিনিয়র রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন ১৯৭০ সনের জুন পর্যন্ত। মন্ট্রিল জেনারেল হসপিটালে গেষ্ট্রোইন্টারোলজির ক্লিনিক্যাল ফেলো হিসেবে কাজ করেছেন ১৯৭২ সন পর্যন্ত। ১৯৭০ সনে তিনি ইন্টারনাল মেডিসিনের উপর রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস থেকে সার্টিফিকেট লাভ করেন। ১৯৭২ সনে তিনি কানাডা থেকে ইন্টারন্যাল মেডিসিনের উপর এফআরসিপি (FRCP) ডিগ্রী লাভ করেন।

অল্পদিনের মধ্যেই চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। দীর্ঘদিন কানাডিয়ান ফেডারেল গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন হাসপাতালে সুনামের সাথে চাকুরি করেছেন। ২০০৩ সনে তিনি ফেডারেল গভর্ণমেন্টের চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি কুইবেক রাজ্যের Ste.Anne's Hospital এ Associate Physician হিসেবে কাজ করছেন।

ডা: রাকিব চৌধুরী চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন এবং এখনো আছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

১. তিনি কানাডা ও কুইবেক মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সদস্য হিসেবে কাজ করছেন।
২. ইংল্যান্ডের জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিলের রেজিস্টার্ড সদস্য।
৩. Ste.Anne's Hospital নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান (১৯৮৪-১৯৮৬)
৪. চেয়ারম্যান, লাইব্রেরী কমিটি Ste.Anne's Hospital, ১৯৭৮।
৫. সদস্য, মেডিক্যাল অডিট এন্ড মেডিক্যাল রেকর্ডস কমিটি, ১৯৮২।
৬. সদস্য, ইনফেকশন কন্ট্রোল কমিটি, ১৯৭৮।

তাঁর বেশ কিছু মূল্যবান প্রকাশনা রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

(a) Giant Cell Myocarditis. Published in Lancet. july 27, 1963
(b) A Case of Congential Hyperbilrubinemia (Dubin Jonson Syndrome) in Pakistan. published in the Journal of Tropical Medicine and Hygine. june 1964

১৯৫২ সনের মহান ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তখন তিনি সেন্ট গ্রেগরী স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন ক্লাস ক্যাপ্টেন এবং একই সাথে স্কুল ক্যাপ্টেন। ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল বেলা তিনি এবং তাঁর অপর দুই ক্লাসমেট শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন (পরবর্তীতে উপ-প্রধানমন্ত্রী) ও আব্দুল ওয়াদুদের নেতৃত্বে মিছিল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক আমতলায় যান এবং প্রতিবাদ সভায়

অংশগ্রহণ করেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ১০ জন করে মিছিল নিয়ে প্রধান ফটকের কাছে গেলে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। ১৯৭১ সনে মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি গঠন করেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে জনমত গঠন করেন।

রাকিব চৌধুরী পরিবারসহ বর্তমানে স্থায়ীভাবে কানাডায় বসবাস করছেন। গণিত ও কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী বড় মেয়ে রুবিনা চৌধুরী (১৯৬৬) কানাডায় এরিকসন কোম্পানীতে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, ছোট মেয়ে সাবিনা চৌধুরী(১৯৬৭) এমএসসি কানাডার মন্ট্রিলে কর্মরত এবং একমাত্র ছেলে প্রফেসর আসিফুর রব চৌধুরী(১৯৭১) এভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি কানাডার কনকর্ড ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করছেন।

প্রফেসর উম্মে আয়েশা খাতুন চৌধুরী (১৯২৫-২০০৫)

উম্মে আয়েশা খাতুন চৌধুরী ১৯২৫ সনে ঢাকা শহরের দেওয়ান বাজারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রিন্সিপাল আবদুর রব চৌধুরী ও উম্মে আরেফা খাতুন চৌধুরীর ১ম কন্যা।

আয়েশা সিদ্দিকা

আয়েশা খাতুন পিতার কর্মস্থল চট্টগ্রামের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডাঃ খাস্তগীর গালর্স হাই স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক, ঢাকার ইডেন কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন। উচ্চ শিক্ষার্থে ভর্তি হন কোলকাতার লেডী ব্র্যাবোর্ণ কলেজে। ১৯৪৫ সনে তিনি গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৭ সনে তিনি বিএড ডিগ্রী অর্জন করেন।

পিতার আদর্শ অনুসরণ করে সদ্য স্বাধীন দেশে শিক্ষকতাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সনে ফরিদপুর গভর্ণমেন্ট গালর্স হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ পান। ঐ বছরেই সরকারি বৃত্তি পেয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষায় এমএস ডিগ্রী অর্জন করে ১৯৫২ সনে দেশে ফিরে আসেন। ১৯৫৪ সনে তাঁকে বরিশাল অঞ্চলের স্কুলসমূহের সহকারী পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ১৯৫৭ সনে তাঁকে বরিশাল গালর্স হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদায়ন করা হয়। ১৯৫৯ সনে তিনি দ্বিতীয়বার উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে In service Education Training গ্রহণ করে ১৯৬০ সনে দেশে ফিরে ঢাকায় Education Extension Centre এ বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান করেন।

১৯৬২ সনে পদোন্নতি পেয়ে Education Senior Service এর অন্তর্ভুক্ত হন এবং বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শক পদে যোগদান করেন। পর্যায়ক্রমে খুলনা, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। তখন বেশ কয়েকবার তাকে ডিডিপিআই (DDPI) এর অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৬ সনে তাঁকে রাজশাহী বিভাগের ডিডিপিআই (DDPI) হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তাঁর পূর্বে কোন মহিলা ডিডিপিআই (DDPI) পদ লাভ করেননি। ১৯৭৯ সনে তিনি রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। আয়েশা খাতুন ছিলেন পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে শিক্ষা বোর্ডের ১ম মহিলা চেয়ারম্যান । একই সময়ে তিনি ডিডিপিআই (DDPI) এর অতিরিক্ত দায়িত্বও পালন করেন। শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে ১৯৮১ সনের শেষ দিকে তিনি জনশিক্ষা পরিদপ্তরে যুগ্ম পরিচালক (Joint Director) হিসেবে যোগ দেন। আশির দশকে সরকার প্রশাসনিক পুনর্গঠনের আওতায় জনশিক্ষা পরিদপ্তর বিলুপ্ত করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর গঠন করে। আয়েশা বেগম উক্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমিক শাখার ডাইরেক্টর হিসেবে যোগ দেন এবং সেখানেও তিনি ছিলেন প্রথম মহিলা ডাইরেক্টর। ১৯৮৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে সে পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি গালর্স গাইড এ্যাসোসিয়েশনের আঞ্চলিক কমিশনার, জাতীয় কমিশনার ও চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন অত্যন্ত দক্ষতা ও সাবলীলভাবে। অবসর গ্রহণের পরও উক্ত সংস্থার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।

২০০৫ সনে এই মহীয়সী নারী ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তিনি চিরকুমারী ছিলেন।

সাঈদা সিদ্দিকী (১৯৩১-১৯৯৬)

উম্মে সাঈদা চৌধুরী (বিয়ের পরে সাঈদা সিদ্দিকী) ১৯৩১ সনের ৫ নভেম্বর পুরান ঢাকার দেওয়ান বাজারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খান সাহেব আবদুর রব চৌধুরীর ২য় কন্যা। সাঈদা চৌধুরী চট্টগ্রামের ডাঃ খাস্তগীর গালর্স হাই স্কুল থেকে ১ম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। উচ্চ শিক্ষার্থে ভর্তি হন ঢাকার ইডেন কলেজে। তিনি ইডেন কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে আইএ এবং গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগ থেকে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। স্কলারশীপ পেয়ে তিনি আমেরিকার ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। কর্মকালে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিএড. ডিগ্রী অর্জন করেন।

আজিমপুর গালর্স স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়ে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ছিলেন ঐ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক। দীর্ঘ ৩২ বছর অত্যন্ত সুনাম এবং নিষ্ঠার সাথে শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি সিনিয়র শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষিকা এবং পরে উক্ত স্কুলের প্রভাতি শাখার প্রধান শিক্ষিকা হিসেবেও কৃতিত্বের

স্বাক্ষর রাখেন। শিক্ষকতা জীবন প্রায় ৩৪ বছর। ১৯৬৯ সনে মাধ্যমিক পর্যায়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সনে তিনি 'বাংলাদেশ সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ' পদক লাভ করেন। তাঁর অসংখ্য খ্যাতিমান ছাত্রী রয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তাঁর সরাসরি ছাত্রী ছিলেন।

তিনি ইডেন কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এজন্যে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে রাসটিকেট করার হুমকি দিয়েছিল।

তিনি একজন সুলেখক ছিলেন। দুই খণ্ডে রচিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'লৌকিক-অলৌকিক' পাঠক মহলে সাড়া জাগায়। তাঁর লেখা 'সাহিত্য মুকুর' 'বাঙলা সাহিত্য' ও English Grammer দীর্ঘদিন স্কুল পাঠ্য ছিল। ছাত্রীজীবন থেকেই তিনি আবৃত্তি চর্চা, নাটক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ছিলেন।

সাঈদা সিদ্দিকী

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ, জগন্নাথ কলেজের সাবেক প্রিন্সিপাল ও বাঙলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক ড: আশরাফ সিদ্দিকীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ১৯৫১ সনের ডিসেম্বর মাসে। আশরাফ সিদ্দিকী তখন সরকারী কলেজের তরুণ অধ্যাপক। বিয়ের উদ্যোক্তা ছিলেন আবু সাঈদ চৌধুরী (পরে বিচারপতি ও রাষ্ট্রপতি), রাজনীতিবিদ ও আওয়ামী লীগ নেতা শামসুল হক ও তাঁর স্ত্রী ইডেন কলেজের অধ্যাপিকা ড: আফিয়া দিল্।

সাঈদা সিদ্দিকীর দুই ছেলে ও তিন মেয়ে সকলেই উচ্চ শিক্ষিত। তাঁর মেয়ে ড: তাসনীম আরেফা সিদ্দিকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি এ বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করছেন। তাঁর স্বামী সিএ আবরারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁর অপর মেয়ে নাহিদ আরেফা সিদ্দিকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি (অনার্স) ও এমএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন। ছোট মেয়ে রিফাত আরেফা সিদ্দিকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজি বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে বিএসসি(অনার্স) ও এমএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন। উভয়ই ঢাকার ধানমন্ডিতে অবস্থিত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সিদ্দিকীন'স এর যথাক্রমে প্রিন্সিপাল ও চেয়ারম্যান। সাঈদা সিদ্দিকীর বড় ছেলে সাঈদ সিদ্দিকী ও ছোট ছেলে রিয়াদ সিদ্দিকী তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্যার্টস আই এর যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টর। ১৯৯৫ সনের ২৮ ডিসেম্বর মাত্র ৬৪ বছর বয়সে সাঈদা সিদ্দিকী ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে স্বামী ড: আশরাফ সিদ্দিকীর সম্পাদনায় 'স্মৃতির মানুষ' নামে

একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় যাতে তাঁর সহপাঠী, স্বজন ও সহকর্মীরা স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। ড. আশরাফ সিদ্দিকী ফাউন্ডেশন থেকে নারী লেখকদের সাঈদা সিদ্দিকী পদক প্রদান করা হয়।

রাজিয়া খাতুন চৌধুরী(১৯৩২)

রাজিয়া খাতুন চৌধুরী (বিয়ের পর রাজিয়া হক) ১৯৩২ সনের ৫ নভেম্বর ঢাকা শহরে পিতার দেওয়ান বাজারের বাসায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আবদুর রব চৌধুরী ও উম্মে আরেফা খাতুনের কনিষ্ঠা কন্যা। রাজিয়া চৌধুরী পড়াশোনা করেন ডা: খাস্তগীর গার্লস হাই স্কুল, ইডেন কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি ১৯৫৩ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে এমএ পাশ করেন। ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিএড ডিগ্রী অর্জন করেন।

রাজিয়া চৌধুরী পিতা ও বড় ভাই-বোনদের অনুসরণ করে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হন। তিনি ঢাকা মুসলিম হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯৬১ সনে সেনা কর্মকর্তা ডা: আব্দুল হকের (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল (অব:)) সাথে বিয়ে হয়। বিয়ের পর স্বামীর সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি চলে যান। ফলে শিক্ষকতা পেশা থেকে সরে যেতে হয়। তিনি ইডেন কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় বড় বোন সাঈদা চৌধুরীর সাথে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

রাজিয়া হকের দুই ছেলে নওশীর হক ও জিয়াউল হক। জিয়াউল হক মাত্র ৩২ বছর বয়সে মারা যান। নওশীর হক লন্ডনে বসবাস করছেন।

আবদুস সালাম চৌধুরী (১৯০৩- ১৯৬৩)

আসাম সিভিল সার্ভিসের কৃতি পুরুষ আবদুস সালাম চৌধুরী ১৯০৩ সনে হবিগঞ্জের দরিয়াপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আবদুল কাদির চৌধুরীর ৪র্থ সন্তান। পড়াশোনা করেন ঢাকা মুসলিম হাই স্কুল, ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন ও এলএলবি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি মুসলিম হাই স্কুলের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯২৫ সনের ২৩ অক্টোবর মুসলিম হাই স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক খান বাহাদুর ওবায়দুল হক এমএ বিএল সাহেব (তিনি তখন বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য) আবদুস সালাম চৌধুরীকে একটি চারিত্রিক সনদ প্রদান করেন চাকুরি লাভের জন্য। আবদুস সালাম চৌধুরী বড় ভাই আবদুর রব চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে তাঁর বাসায় থেকে পড়াশোনা করেন।

পড়াশোনা শেষ করে হবিগঞ্জ বারে আইন পেশায় নিয়োজিত হন। ১৯৩৪ সনে তিনি আসাম সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। দেশ বিভাগের পূর্বে তিনি আসামের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায় ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, সেকেন্ড অফিসার ও মহকুমা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগ এবং ঐতিহাসিক সিলেট রেফারেন্ডামের সময় তিনি করিমগঞ্জ মহকুমায় এডিশনাল এসডিও বা সেকেন্ড অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এসময় এসডিও (পরবর্তীতে সচিব ও এম এন এ) ছিলেন হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং নিবাসী ইয়াহিয়া খান চৌধুরী (সাবেক মন্ত্রী জাকারিয়া চৌধুরী ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী জাকির খান চৌধুরীর পিতা) এবং ডিএসপি ছিলেন সিলেটের এমএ

হক সাহেব (পরবর্তীতে মন্ত্রী)। দেশ বিভাগের কয়েক মাস পরে তারা নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে অপশন দিয়ে মৌলভীবাজার মহকুমায় বদলি হয়ে চলে আসেন। আব্দুস সালাম চৌধুরী মৌলভীবাজার ও সিরাজগঞ্জ মহকুমায় এসডিও, খুলনা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ছিলেন। তিনি করাচীতে বদলি হয়েছিলেন কিন্তু বদলি বাতিল করতে সক্ষম হন। ১৯৫৩ সন থেকে ১৯৬০ সন পর্যন্ত তিনি রাজশাহী, দিনাজপুর ও কুমিল্লার জেলা প্রশাসক/জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করেছেন। একাধারে তিনটি জেলায় ডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে তিনি তাঁর মেধা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৬০ সনের শেষ দিকে পদোন্নতি পেয়ে রাজশাহী বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। সেসময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারারের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৬৩ সনে কর্তব্যরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন।

মৃত্যুকালে ১ ছেলে ও ৪ মেয়ে রেখে যান। তাঁরা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত। তাঁর পুত্র আবদুল মোমিন চৌধুরী জনতা ব্যাংকের উপ-মহাব্যবস্থাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ২য় মেয়ে ছালেহা চৌধুরীর স্বামী ড. মোঃ আইয়ুবুর রহমান সাবেক সচিব, ৩য় মেয়ে মফিদা চৌধুরীর স্বামী আলী রাজা খান ছিলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য এবং ৪র্থ মেয়ে মওদুদা চৌধুরীর স্বামী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রফিকুর রাজা চৌধুরী। তাঁদের সন্তানরা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত।

এডভোকেট আবদুস সোবহান চৌধুরী(১৯০৭-১৯৯২)

আবদুস সোবহান চৌধুরী ১৯০৭ সনে হবিগঞ্জের দরিয়াপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি আবদুল কাদির চৌধুরীর ৫ম পুত্র। আবদুস সোবহান চৌধুরী পড়াশোনা করেন ঢাকা মুসলিম হাই স্কুল, ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন ও এলএলবি ডিগ্রী লাভ করেন। বড় ভাই আবদুর রব চৌধুরী তখন ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক। তাঁর তত্ত্বাবধানে থেকে তিনি পড়াশোনা করেন।

এড আব্দুস সোবহান চৌধুরী ১৯৩৬ সনে হবিগঞ্জ বারে যোগ দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৩৭ সনে তিনি হবিগঞ্জ ত্যাগ করে সিলেট বারে যোগ দেন। অল্পদিনের মধ্যেই আইন পেশায় খ্যাতি অর্জন করেন এবং একজন নেতৃস্থানীয় আইনজীবী হিসেবে পরিচিতি পান। অভিজ্ঞ আইনজীবী ও দেওয়ানী আইনে গভীর জ্ঞানের কারণে ১৯৬১ সনে সরকার তাঁকে সিলেট জেলার গভর্ণমেন্ট প্লীডার (জিপি) হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন। ১৯৬৬ সন পর্যন্ত তিনি সরকারি উকিলের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সিলেট বার এ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারী এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন । সিলেট আইন কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি ল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন। প্রিন্সিপাল হিসেবে আবু আহমদ হাফিজ সাহেব (অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের পিতা) অবসর গ্রহণ করার পর তিনি প্রিন্সিপাল হিসেবে নিয়োগ পান। শুরু থেকেই কলেজ গভর্ণিং বডির সদস্য ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। ল কলেজের উন্নয়নে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ১৯৮৭ সনে আইন পেশায় ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করেন। ১৯৯২ সনে এই প্রথিতযশা আইজীবী সিলেট শহরে ইন্তেকাল করেন।

প্রিন্সিপাল আবদুস সোবহান চৌধুরী

আবদুস সোবহান চৌধুরী মৃত্যুকালে ৩ পুত্র ও ৭ কন্যা রেখে যান। তাঁর ১ম ছেলে এডভোকেট আবদুস সবুর চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে বিএ(অনার্স) ও এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। পরে এলএলবি ডিগ্রী অর্জন করে সিলেট বারে আইন পেশায় নিয়োজিত হন। বর্তমানে বারের সিনিয়র আইনজীবী। অপর পুত্র বেলাল আহাম্মদ চৌধুরী জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ(অনার্স) ও এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি জাকসুর ক্রীড়া সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। বর্তমানে আয়্যারল্যান্ডে কর্মরত আছেন। বড় মেয়ে মাসরুবা চৌধুরী জলির স্বামী সাবেক রাষ্ট্রদূত মহিউদ্দিন আহমদ জায়গীরদার, মেজো মেয়ে লাইলী চৌধুরীর স্বামী এমসি কলেজের সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল মোঃ আহমদ চৌধুরী এবং ছোট মেয়ে আফরোজী চৌধুরীর স্বামী সাবেক সচিব সৈয়দ আমিরুল মূলক। তাঁদের সন্তানরা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত এবং দেশে বিদেশে উচ্চ পদে কর্মরত আছেন।

আগেই বলা হয়েছে, আব্দুল কাদের চৌধুরীর পাঁচ পুত্র সন্তান ছিলেন। তাদের মধ্যে প্রথম সন্তান হলেন আব্দুন নূর চৌধুরী। তিনি বাড়িতে জমিদারি পরিচালনা করতেন। আব্দুন নূর চৌধুরী ২১ বছর বয়সে আততায়ীর হাতে ছুরিকাঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর একমাত্র মেয়ে বদরুন্নেছা চৌধুরী। তার সন্তানগণ সমাজে প্রতিষ্ঠিত। আব্দুল কাদের চৌধুরীর তৃতীয় সন্তান হলেন ডা. আব্দুল মান্নান চৌধুরী।

ডা. আব্দুল মান্নান চৌধুরী

ডা. আব্দুল মান্নান চৌধুরী

ডা. আব্দুল মান্নান চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৫ সনে নিজ গ্রাম দরিয়াপুরে। তিনি আব্দুল কাদের চৌধুরীর তৃতীয় সন্তান। আব্দুল মান্নান চৌধুরী ডিব্রুগড় (আসাম) মেডিকেল স্কুল থেকে ডাক্তারী পাস করে দরিয়াপুর গ্রামে নিজ বাড়িতে প্র্যাকটিস করেন। তিনি স্থানীয় আসাম লোকাল গভর্নমেন্টের সরপঞ্চ হিসাবে এলাকার উন্নয়নে অনেক অবদান রাখেন। স্বদেশী আন্দোলনের মানুষদের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করতে তিনি বাড়িতে তাঁতের মেশিন বসিয়ে চরকায় সূতা কাটাতেন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন

চলাকালীন অবস্থায়ই ১৯৫১ সনে মাত্র ২৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তার এক ছেলে আব্দুল হান্নান চৌধুরী ও এক মেয়ে কামরুন্নেছা চৌধুরী। কামরুন্নেছা চৌধুরীর স্বামী এস এম নুরুল্লাহ খান ১৯৬৪ সনে ভৈরব-কুলিয়ারচরের এমপি ছিলেন। উল্লেখ্য, কামরুন্নেছা চৌধুরীর ১০ ছেলে ও ১ মেয়ের মধ্যে তৃতীয় সন্তান নুরুল কাদের জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন ইস্ট পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি ১৯৮৪ সনে কুলিয়ারচর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। বর্তমানে তাঁর ছোটভাই নুরুল মিল্লাত উপজেলা চেয়ারম্যান।

আবদুল হান্নান চৌধুরী (১৯২১-২০০৭)

আবদুল হান্নান চৌধুরী ১৯২১ সনে হবিগঞ্জের দরিয়াপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ডা. আবদুল মান্নান চৌধুরী।

আবদুল হান্নান চৌধুরী ১৯৩৯ সনে করিমগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯৪১ সনে রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন। তিনি ১৯৪৩ সনে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৪ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে এমএ ডিগ্রী অর্জন করেন। শিক্ষকতা করার সময়ে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিটি ডিগ্রী অর্জন করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলমান অবস্থায় বৃটিশ সরকার সামরিক প্রয়োজনে আসাম প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট এয়ারপোর্ট/এ্যারোড্রাম নির্মাণ করে এবং শিক্ষিত যুবকদের

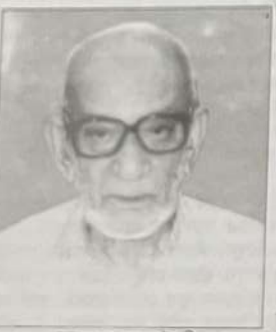

আব্দুল হান্নান চৌধুরী

এসকল স্থাপনা ব্যবস্থাপনায় নিয়োগদান করে। আবদুল হান্নান চৌধুরী সেসময় বৃটিশ বিমান বাহিনীতে এ্যারোড্রাম অফিসার হিসেবে নিয়োগ পান। করিমগঞ্জ মহকুমার পাথারকান্দি এয়ারপোর্টে চাকুরি করার পর তিনি রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্টে যোগদান করেন। সাব-রেজিস্ট্রার হিসেবে সুরমা ও বরাক ভ্যালীর ভাঙ্গা, বদরপুর প্রভৃতি স্থানে চাকুরি করেছেন। কিন্তু পারিবারিক পরিবেশ ছিল শিক্ষকতার অনুকূলে। বিশেষ করে তাঁর চাচা প্রিন্সিপাল আবদুর রব চৌধুরীর প্রভাবে তিনি রেজিস্ট্রেশন বিভাগের চাকুরি ত্যাগ করে ১৯৪৬ সনে শিক্ষা বিভাগে যোগ দেন। ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সনে তিনি আসাম সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু দেশ বিভাগ এবং রেফারেন্ডামের মাধ্যমে সিলেট জিলা বিভক্ত হয়ে বৃহদাংশ পাকিস্তানে এবং করিমগঞ্জসহ একাংশ আসামে অন্তর্ভুক্তির ফলে অন্য অনেকের মতো তাঁরও ইএসি পদে চাকুরি লাভ সম্ভব হয়নি। দেশ বিভাগের শর্তানুযায়ী তিনি পাকিস্তানে অপশন দিয়ে মৌলভীবাজার গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে যোগ দেন। তারপর হবিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে

বদলি হন। অতঃপর সরকারি হাই স্কুল থেকে বদলি হয়ে শিক্ষা প্রশাসনে ইন্সপেক্টর অব স্কুলস হিসেবে যোগ দেন।

১৯৬৮ সনে তিনি মহকুমা শিক্ষা অফিসার হিসেবে বগুড়ায় যোগদান করেন। তারপর সিলেট সদর মহকুমায় চাকুরি করেছেন। ১৯৭৭ সনে তিনি ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুলস হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে চট্টগ্রাম জেলায় যোগদান করেন। ১৯৭৭ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর এলাকাবাসীর অনুরোধে তিনি হবিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। প্রায় বছর তিনেক প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে পুরোপুরি অবসরে যান।

২০০৭ সনে প্রায় ৮৭ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে ৫ ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে যান।

আবদুল হাছিব চৌধুরী(১৯৫৭)

আবদুল হাছিব চৌধুরীর জন্ম ১৯৫৭ সনে দরিয়াপুর গ্রামে। তাঁর পিতা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মরহুম আবদুল হান্নান চৌধুরী। তিনি হবিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল থেকে ১৯৭৩ সনে এসএসসি, ১৯৭৫ সনে কবি নজরুল সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ১৯৭৭ সনে ঢাকা আইডিয়েল কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন। পরে তিনি গ্রীন ইউনিভার্সিটি থেকে এলএলএম এবং নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে এএস বিএসসি ও এমবিএ ডিগ্রী লাভ করেন।

আব্দুল হাসিব চৌধুরী

আব্দুল হাছিব চৌধুরী স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থাতেই ১৯৬৯ সনের গণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে কাজ করেন। স্বাধীনতার পর বামপন্থী ছাত্র সংগঠন ও ছাত্র আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন, বাঙলা ছাত্র ইউনিয়ন ও জাগমুই ইত্যাদির সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে কর্মরত থাকা অবস্থায় শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার দায়ে ১৯৭৮ সনে অন্যায়ভাবে চাকুরিচ্যুত হন। আশির দশকে প্রথমে সৌদি আরব এবং সেখান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এজন্যে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তিনি বর্তমানে গণফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক। হবিগঞ্জের উন্নয়নে তিনি সর্বদা সক্রিয়। বিভিন্ন সময়ে হবিগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান ও তার মামার বাড়ি কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম- মিঠামইন আসন থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর বড় মেয়ে আফিফা চৌধুরী বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নরত,

ছোট মেয়ে তারান্নুম চৌধুরী ব্রাক ইউনিভার্সিটির তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগে এবং একমাত্র ছেলে তানভীর চৌধুরী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে এ লেভেল পাশ করেছে।

আবদুল বাছিত চৌধুরী(১৯৬১)

আবদুল বাছিত চৌধুরীর জন্ম ১৯৬১ সনে হবিগঞ্জ সদর থানার দরিয়াপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আবদুল হান্নান চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র। আবদুল বাছিত চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম ডিগ্রী লাভ করেন। বাছিত চৌধুরী ১৯৮৪ সনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের প্রচার সম্পাদক ও ১৯৯০ সনে কৃষকদল কেন্দ্রীয় কমিটির আইন সম্পাদক হিসাবে স্বৈরশাসন বিরোধী ছাত্রগণ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

আব্দুল বাসিদ চৌধুরী

তিনি বেশ কয়েক বছর সুপ্রীম কোর্টে আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। পরে উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় ইউরোপে পাড়ি জমান। তিনি একজন মননশীল লেখক ও সমাজ পরিবর্তন প্রত্যাশী প্রতিবাদী কবি। ১৯৮৪ সনে তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'একটি গণযুদ্ধের প্রতীক্ষায়' প্রকাশিত হয়। তার দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ ' রাজপথে জনতার অভিষেক' এবং তার সর্বশেষ কাব্য গ্রন্থ 'একটি বৃত্তের আবর্তে' পাঠক মহলে সাড়া জাগিয়েছে। প্রবাসে থেকেও লেখালেখি অব্যাহত রেখেছেন।

এছাড়াও আব্দুল হান্নান চৌধুরীর অন্য সন্তানরাও সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর প্রথম পুত্র আব্দুল হাদি চৌধুরী (১৯৫০) বি.কম. পাশ করে ইস্টার্ন হেরাল্ড ও যুগভেরীর হবিগঞ্জ সংবাদ দাতা হিসাবে কাজ করেন। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এনজিও ব্র্যাকে উপ-মহা হিসাবরক্ষক হিসাবে চাকরি শেষে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে সপরিবারে বসবাস করছেন। ছোট মেয়ে সাবেক ছাত্রদল নেত্রী আসকিয়া চৌধুরী (১৯৬৪) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা (অনার্স) ও এম এ পাশ করে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত। অন্য সন্তান আব্দুল হামিদ চৌধুরী (১৯৬০) উত্তরা ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার হিসাবে চাকরি ছেড়ে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি করছেন। আর এক সন্তান আব্দুল মুকছিদ চৌধুরী (১৯৭৪) ইতিহাসে (অনার্স) ও এম এ পাশ করে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত। দরিয়াপুরের চৌধুরী পরিবারের ইতিহাস এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল মাত্র। অনেক তথ্য না পাওয়ায় সন্নিবেশিত করা হয়নি। বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্ম এ পরিবারের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য জেনে বিন্দুমাত্র হলেও উপকৃত হবে বলে আশা করি।

আনোয়ার হোসেন চৌধুরী : উপ-সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়